হযরত মা হালিমার ঘরে রাসূলে পাক (সাঃ)-এর কিছু অলৌকিক ঘটনা

মাওলানা এম এ মান্নান

(মাওলানা এম এ মান্নান-এর ক্যাসেট থেকে)

হযরত মা হালিমা বলেন, শিশু মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রশান্ত চেহারা, উদার চাহনি, দিলখোলা হাসি আমাদেরকে পাগল করে তুলল, তাঁর আচরণে আমাদের সকলের মন জয় করে নিল। একদণ্ডের জন্যও তাঁকে ছেড়ে কোথাও যেতে মন ঠায় দিত না। চোখের আড়াল হলেই আমি বিচলিত হয়ে পড়তাম। তাঁর দুধ ভাইবোনদের ও ছিল একই অবস্থা। সারাদিন তাদের দুধভাইকে নিয়ে মেতে থাকত। আমার স্বামী ও এই ছেলের জন্য সদা চঞ্চল থাকতেন। আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতাম যে, আমাদের এই গরীব ঘরে আল্লাহপাক স্বর্গের চাঁদ পাঠিয়েছেন। শিশু মোহাম্মদ (সাঃ) সুস্থ-সবল ও নাদুসনুদুস হয়ে বেড়ে উঠতে লাগলেন। অন্যান্য ছেলে-মেয়ের তুলনায় তাঁর শরীরের গঠন ছিল খুব বর্ধনশীল। সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় তাকে বেশ বড় বলে মনে হতো।

দেখতে দেখতে দুই বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। দুধ পানের মেয়াদ শেষ। রীতি অনুযায়ী ছেলেকে তাঁর মায়ের নিকট ফেরত দিতে হবে। ছেলেকে ফেরত দিতে হবে এই কথা মনে হলেই আমি অস্থির হয়ে পড়ি। কলিজার টুকরা চোখের মণি এই ছেলেকে ছেড়ে আমি কি করে থাকবো? মনে হচ্ছিল যেন আমি তাঁকে ছেড়ে বাঁচবো না। কিন্তু হাজার হলেও পরের সন্তান মায়ের নিকট তাঁকে পৌঁছাতে হবেই।

দুই বছর হলে আমি তাঁকে দুধ দেয়া বন্ধ করে ছিলাম। দুধ বন্ধ করার পর তিনি প্রথম কথা বললেন। তাঁর কথাট ছিল, আল্লাহু আকবার কাবিরান, অয়াল হামদুলিল্লাহি হামদান কাসীরান, অয়া সুবহানাল্লাহি বুকবাতাও অয়া আসীলা অর্থাৎ আল্লাহ অনেক মহান, আল্লাহর অনেক অনেক প্রশংসা আমি সকাল-সন্ধা তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করি। (বায়হাকী)

হযরত মা হালিমা বলেন, একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেলেকে নিয়ে মক্কায় মা আমেনার কাছে গেলাম। তিনি আমাদেরকে যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করলেন। ছেলের জন্য আমার অন্তর চৌচির হয়ে যেতে লাগল। কলিজা কুটকুট করে কাটতে থাকলো। অন্তত আরো কিছু দিন তাঁকে রাখার অনুমতি পেলে মনের আগুন হয়ত কিছুটা কমতো। তাছাড়া তার কারণে আল্লাহপাক তাদেরকে যে কল্যাণ ও বরকত দান করেছেন, এদিকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মা আমেনার নিকট এই বরকতময় শিশুটিকে আরো কিছুদিন নিজের কাছে রাখার অনমুতি প্রার্থনা করলাম। ঘটনাক্রমে সে সময় মক্কায় মহামারী প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। মহামারীর কথা বলে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে হযরত মা আমিনা আমার অনুরোধে সম্মতি দিলেন। আমি আবার স্বর্গের চাঁদ শিশু মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সাথে নিয়ে বনি সমদপল্লীতে ফিরে এলাম।

প্রাণাধিক প্রিয় শিশু মোহাম্মদ (সাঃ) আবার আমার ঘর আলোকিত করতে লাগলেন। এখন একপা দু'পা করে হাঁটেন। বাইরে এদিক-সেদিক যান। অন্যান্য ছেলেমেয়ের খেলাধুলা দেখেন। কিন্তু নিজে কখনও সেই খেলাধুলায় যোগদান করেন না। দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

মেঘের ছায়া প্রদান

মা হালিমার তিন মেয়ে, বড়টির নাম সায়মা। বয়স আট, অধিকাংশ সময় সেই তার কোরায়শী ভাইকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। অত্যন্ত স্নেহের সাথে তাকে দুলনায় দোল দিত। দুধ মা কিন্তু সব সময় নজর রাখতেন কখন তারা কি করে। কোথায় যায়। কোনভাবে শিশুর কষ্ট হয় কি না।

একদিন সায়মা রাসূলে খোদা (সাঃ)-কে নিয়ে দূরে এক মাঠে ছেলেদের খেলা দেখতে চলে গেল। এদিকে মা হালিমা তাঁদের নিকটে কোথাও না দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। দুপুর বেলা। প্রখর রোদ্রে। নিশ্চয়ই ছেলের কষ্ট হচ্ছে। মা হালিমা ছেলেকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। এমন সময় সামযা রাসূলে খোদা (সাঃ)-কে নিয়ে ফিলে আসলো। মা হালিমা সায়মাকে খুব ধমকালেন। এই প্রখর রৌদ্রে তাকে নিয়ে যাওয়া মোটেই ঠিক হয় নাই-এই বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

সায়মা বলল, মা আমার এই ভাইয়ের কোনই কষ্ট হয় নাই। আমি যখন যেখানে গেছি, সেখানে একখণ্ড মেঘ তাকে ছায়া দিতে থাকে। আমি দাঁড়ালে মেঘটিও দাঁড়িয়ে থাকতো। ভাইয়ের গায়ে কোন রোদ লাগে নাই।

বক্ষ বিদীর্ণকরণ

রাসূলেপাক (সাঃ) এখন কিছুটা বড় হয়েছেন। অন্যান্য শিশুর খেলা দেখতে যান এবং দূরে দাঁড়িয়ে খেলা দেখেন। নিজে অংশ নেন না।

হযরত মা হালিমা বলেন, একদিন আমার প্রাণের টুকরা ছেলে বললেন, আম্মাজান, আমার ভাইদেরকে দিনের বেলায় দেখি না কেন? তারা কোথায় যায়। আমি বললাম, আমার জীবন তোমার জন্য উৎসর্গ, তারা ছাগল চরাতে মাঠে যায়। সকালে যায় আবার সন্ধ্যায় ফিরে আসে। তাই তুমি তাদেরকে দেখতে পাও না। তিনি বললেন, কাল থেকে আমাকেও তাদের সাথে পাঠিয়ে দেবেন। পরেরদিন থেকে দুগ্ধভাইদের সাথে ছাগল চরাতে যাওয়া শুরু করলেন। খুশী মনে যেতেন এবং খুশী মনে ফির আসতেন। দু'জাহানের সরদার (সাঃ) যে গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন। অদম্য কর্মস্পৃহা ও ব্যস্ততার মধ্যে তার দিনগুলো যে অতিবাহিত হবে-শৈশবের কার্যকলাপেই তার আভাস ফুটে উঠেছিল।

এমনি একদিন তিনি তাঁর দুগ্ধভ্রাতাদের সাথে চারণভূমিতে ছাগল চরাতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর দুগ্ধভ্রাতা আবদুল্লাহ দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ী এসে বলল, বাবা, বাবা, জলদি তোমরা আমার ভাইয়ের নিকট যাও। হয়ত তোমরা তাকে মৃত পাবে। আমরা বললাম কি হয়েছে খুলে বল।

আবদুল্লাহ বলল (কোন কোন রাওয়াতে সামুরাহ) আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় দুজন সাদা কাপড় পরিহিত লোক ছোঁ মেরে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে নিয়ে এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেল, সেখানে তাকে চিৎ করে শুয়ে দিয়ে তার পেট কেটে ফেলেছে। আমি সেই অবস্থায় তাকে রেখে এসেছি। শিগগির যাও। দেখ জীবিত পাও কি না।

একথা শুনে আমি এবং আমার স্বামী দৌড়ে মাঠে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি নির্বাক এবং বজ্রাহতের মতো পড়ে আছেন। ভয়ে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে বাবা! উত্তরে তিনি বললেন, সব ঠিক আছে আম্মাজান। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় তিনজন সাদা পোশাকধারী লোক এসে আমাকে এখানে নিয়ে আসে। তাদের একজনের হাতে ছিল একটি রূপার পাত্র। দ্বিতীয় জনের হাতে ছিল সবুজ পান্নার একটি প্লেট যা বরফে পরিপূর্ণ ছিল। তারা আমাকে আস্তে করে শুইয়ে দিল। এরপর তাদের একজন আমার নাভি থেকে পেট বিদীর্ণ করে ফেলল, আমি দেখতে ছিলাম কিন্তু কোন অনুভূতি ছিল না। কোন কষ্টও হয়নি। এরপর সে আপন হাত আমার পেটে ঢুকিয়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে নিল। এরপর এগুলো বরফ পানি দিয়ে উত্তমরূপে ধৌত করে আবার যথাস্থানে রেখে দিল। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে বলল, সরে এসো। আল্লাহ তোমাকে যে আদেশ করেছেন তা পূর্ণ কর। সে মতে সে আমার কাছে এলা এবং আমার পেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ড বের করে নিল। সেটি বিদীর্ণ করে তার মধ্যে থেকে একটি কাল রক্তভর্তি বিন্দু বের করে দূরে ফেলে দিল। সে বলল, হে আল্লাহর হাবীব, এটি শয়তানের অংশ ছিল। এরপর নিজের কাছ থেকে একটি বস্তু দিয়ে এটি পূর্ণ করে দিল। তার পর এর উপর একটি

নূরোজ্জ্বল মোহর এঁটে দিল। যার শীতলতা আমি এখনও অনুভব করছি। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, তোমরা এখন সরে যাও। তোমরা আল্লাহর আদের্শ পূর্ণ করেছে। এরপর সে আমার কাছে এসে আমার বুকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, এখন তাঁকে ওজন কর দেখ যে, তাঁর ওজন সমস্ত উম্মতের ওজনের চেয়ে বেশী হবে। অতঃপর সে আমাকে হাত ধরে আস্তে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর তারা সবাই আমার কপালে চুমু খেল। এরপর বলল, হে আল্লাহর হাবীব, আপনি ভয় পাবেন না। যদি আপনি জানতে পারেন যে, আপনার আল্লাহ আপনার ওপর কত মেহেরবান, তাহলে আপনার চক্ষু শীতল হয়ে যাবে। তার পর তারা আমাকে এখানে রেখে আকাশের দিকে চলে গেল।

আমরা তাকে বাড়ী নিয়ে আসলাম। কিন্তু অন্তর দুরু দুরু করতে লাগল। ব্যাপার কি? এই প্রশ্ন বারবার মনে উদিত হতে থাকলো। কচি বেহেশতী শিশু। নিশ্চয়ই মিথ্যা বলে নাই। আমার আপন ছেলেও তাই দেখে এসেছিল। কিন্তু লোকগুলো কে? কেনইবা তারা তাঁর পেট কাটবে? আর যদি কেটেই ফেলত তাহলে তিনি বেঁচেই বা আছেন কি করে? প্রশ্নের পর প্রশ্ন আমার মনে উদিত হতে থাকলো। স্বামী আমাকের চুপি চুপি বলল, হালিমা! আমার মনে হয় ছেলেকে ভূতপ্রেতে পেয়েছে। ইহা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই চল ছেলেকে তার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

হযরত হালিমা বললেন, আমার মনে হয় তাকে আমরা কোন গণকের নিকট নিয়ে যাই। সে দেখে শুনে তাঁর চিকিৎসা করবে। রাসূলেপাক (সাঃ) বললেন, আমার কিছু হয়নি। আমার শরীর-মন উভয়ই সুস্থ আছে। কিন্তু সে আমাকে বলতে থাকলো, তাঁর ওপর কোন কিছুর আছড় হয়েছে। তারপর আমিও তাদের কথায় বিশ্বাস করে কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর নিকট নিয়ে যাব স্থির করলাম।

❑ অনুঃ মাওলানা এ, কে, এম, ফারূক

পবিত্র ঈদে মিল্লাদুন্নবী (সাঃ)

মাওলানা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ সাফওয়ান

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সেই ইহুদী হুজুরের মাতা আমিনার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি হুজুর (সাঃ)-কে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। সেই ইহুদি হুজুরের সেই চিহ্ন দর্শন করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর বলল ঃ আজ থেকে নবুওয়াত বনী ইসরাঈলদের থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। হে কুরাইশগণ শুনে রাখ। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি এই শিশু (মুহাম্মদ) তোমাদের উপর এমন বিজয় লাভ করবে– যার সংবাদ দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত থেকে প্রচারিত হবে। ইয়াকুব বিন সুফিয়ান নির্ভরযোগ্য সূত্রেই এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হুজুর (সাঃ)-এর জন্মগ্রহণের সময়েই আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশিত হয়েছে। হে মানব জাতি? তাঁর সৌন্দর্যময় জন্মগ্রহণ ও তিরোধানের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন করা

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম বা শুভাগমনের জন্যে শরীয়তের নীতিমালার মধ্য থেকে আনন্দোৎসব করা জায়েয ও অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ, যার কারণ আবু লাহাবের মত অভিশপ্ত কাফের জাহান্নামে থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক সোমবার আল্লাহপাকের খাছ নেয়ামত ভোগ করত, তাহলে ভেবে দেখুন সে সকল মু'মিন মুসলমানদের সৌভাগ্যের পরিমাণ কি হতে পারে? যাদের জীবন মিলাদুন্নবী উদযাপন ও প্রিয় নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের অনুসরণ ও অনুকরণে অতিবাহিত হয়। (মুফতী সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (রহঃ)।

এই পৃথিবীতে হুজুর নবীয়ে আকরাম (সাঃ) হতে আল্লাহর বড় নেয়ামতের কথা চিন্তাও করা দুষ্কর। এতদসম্পর্কে যে অকল্পনীয় খুশী ও আনন্দের প্রকাশ ঘটেছে তার কিছুটা আন্দাজ সিহাহ্ ও তারিখের কিতাবাদি অধ্যয়ন করলে পাওয়া যায়। এই কিতাবসমূহে ফাযায়েল, শামায়েল, এবং খাসায়েলের সূত্রে অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়। যার দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, স্বয়ং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর বরকতময় বেলাদতের (জন্মের) উপর খুশী উদযাপন করেছিলেন।

বর্ণনাবলী সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, বেলাদাতে মোস্তফা (সাঃ)-এর পুরা বছর অভাবিতপূর্ব দৃশ্যাবলী এবং অচিন্তনীয় ঘটনাবলীর বছর হিসেবে চিহ্নিত। এই বছর আল্লাহতায়ালার বিশেষ বিশেষ রহমত নাজিল অব্যাহত ছিল। এমনটি ঐ শুভ মুহূর্তগুলো শতাব্দীকাল যাবত যার এন্তেজার করা হচ্ছিল, তা মাস ও বছরের আবর্তন আশ্চর্যরূপে পরিবর্তন করে এই এন্তেজার মুহূর্তে প্রতিভাত হয়, যার মধ্যে বিশ্ব স্রষ্টার সর্বোত্তম শাহকারকে প্রকাশ্যে আনয়ন করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি স্থায়ী সৌন্দর্যের সাথে আত্মপ্রকাশ করেছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব (সাঃ)-এর দুনিয়ায় আগমনের সময় এত পরিমাণ আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করেছেন, যার দরুন পূর্ব -পশ্চিমের আকাশজুড়ে রৌশনী ছড়িয়ে পড়েছিল। হযরত ওসমান বিন আবুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর মা তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন ঃ যখন বেলাদতে নবী (সাঃ)-এর জন্মের সময় উপস্থিত হল তখন আমি সাইয়্যেদাহ আমেনা (রাঃ)-এর ঘরে ছিলাম, আমি দেখতে ছিলাম যে তারকাসমূহ আকাশ হতে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। আমি উপলব্ধি করেছিলাম যেন এগুলো আমার মাথার উপর ভেঙ্গে পড়বে। তারপর যখন তার জন্ম হল, তখন সাইয়্যেদাহ আমেনা (রাঃ) হতে এমন নূর বিকশিত হল, যার আলোকে পুরা ঘর যেখানে আমরা ছিলাম আলোকে ঝলমল করতে লাগল এবং আমি প্রত্যেক বস্তুতে কেবল নূর দেখছিলাম।

গ্রন্থপুঞ্জি

(১) শায়বাণী, আল আহাদু ওয়াল মাছানী, পৃষ্ঠা ৬৩১, রেওয়ায়েত সংখ্যা ১০৯৪, বর্ণনায় উম্মে ওসমান বিনতে আবুল আস (রাঃ), (২) তাবারানী আল মু'জামুল কবীর খণ্ড ২৫, পৃষ্ঠা ১৪৭, ১৮৬, বর্ণনা নম্বর-৩৫৫, ৪৫৭, (৩) মাওয়ারদী-এলামুন নাবুওয়াহ ঃ পৃষ্ঠা ২৪৭. (৪) তাবারী ঃ তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খন্ড-১,পৃষ্ঠা ৪৫৪, (৫) বায়হাকী, দালায়েলুন, নাবুওয়্যাতে ওয়া মারিফাতি আহওয়ালে ছাহিবিশ শারিয়াতি, খন্ড ১ পৃষ্ঠা-১১১, (৬) আবু নাঈম ঃ দালায়েলুন নাবুওয়্যাত, পৃষ্ঠা ১৩৫, বর্ণনা সংখ্যা ৭৬, (৭) ইবনে জাওজী, আল মুনতাজামু ফিতারি-খিল উমামি ওয়াল মুলুক, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৭, (৮) ইবনে আসাকির, তারিখ-ই দামেস্ক আল কবীর, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭৯, (৯) ইবনে আসাকির, আসসিরাতুন নাবাবিয়্যাহ ঃ খন্ড ৪৬ পৃষ্ঠা ৪৬, (১০) ইবনে কাছির, আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াহ ঃ খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৬, (১১) হায়চামী মাজমাউয যাওয়িত ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়িদ খন্ড-৮, পৃষ্ঠা ২২০, (১২) ইবনে রজব হাম্বলী ঃ লাতাইফুল মায়ারিফি ফিমা লওয়াছিমিল আমি মিনাল, ওয়াজাইফ। পৃষ্ঠা ১৭৩, (১৩) আসকালীন ঃ ফতহুল্ বারী খন্ড ৬, পৃষ্ঠা-৫৮৩।

(১৪) হযরত মুফতী সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আমীনুল ইহ্সান (রহঃ)।

(১৫) হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমীনুল ইসলাম (রহঃ)।

(১৬) শাইখুল ইসলাম ডাক্তার মোহাম্মদ তাহের আল কাদেরী।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমি আদম সন্তানদের প্রত্যেক যুগের উত্তম শ্রেণীতে যুগ পরম্পরায় স্থানান্তরিত হয়ে এসেছি। শেষ পর্যন্ত সেই যুগে জন্মগ্রহণ করেছি যে যুগে আমি বর্তমান আছি। (সহীহ বুখারী) [(১) বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ ঃ খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২০৫, বর্ণনা সংখ্যা ৫৪৯৩]

হযরত ওয়াছিলা ইবনে আছকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি হুজুর নবীয়ে আকরাম (সাঃ)কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ পাক হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধর হতে কেনানার কবিলাকে নির্বাচন করেছেন, আবার কেনানার কবিলা হতে কুরাইশ বংশকে নির্বাচন করেছেন। আবার কুরাইশ বংশ হতে বনুহাসিম পরিবারকে নির্বাচন করেছেন। অবশেষে বনু হাসিম পরিবার হতে আমাকেই মনোনীত করেছেন। [(১) বঙ্গানুবাদ মেশকাত, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২০৫, বর্ণনা সংখ্যা ৫৪৯৪]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত– তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ আমার উদাহরণ এবং অন্যান্য নবীদের উদাহরণ হল এরূপ, যেমন একটি প্রাসাদ, যা অনুপম সুন্দর করে নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এক স্থানে একটি ইটের যায়গা খালি রাখা হয়েছে। লোকজন প্রাসাদটি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয় যে, প্রাসাদটি এত সুন্দর করে নির্মাণ করা হয়েছে, অথচ এর একটি ইটের স্থান খালি রাখা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন– আমিই সেই খালি ইটের স্থানটি পূর্ণ করেছি। আমার দ্বারাই ওই প্রাসাদটির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং আমার দ্বারাই নবী-রাসূলদের আগমনের ধারা শেষ করা হয়ছে। [(১) মেশকাত শরীফ, (বঙ্গানুবাদ), খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২০৫, বর্ণনা সংখ্যা ৫৪৯৯)

হযরত যাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত– তিনি বলেছেন, হুযুর নবীয়ে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কাউকেই দেয়া হয়নি। যথা ঃ (১) আমাকে এক মাসের দূরত্বের মধ্যে ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য মাটিকে মসজিদ এবং পবিত্রতা লাভের উপাদান বানানো হয়েছে। তা আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যাবে, সে যেন সেখানেই নামায আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্য গণিমতের মাল হালাল করা হয়েছে, যা ইতোপূর্বে কারও জন্য হালাল ছিল না। (৪) আমাকে সুপারিশের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নবীকে পাঠানো হয়েছে শুধু নিজ নিজ কাওমের জন্য, কিন্তু আমাকে পাঠানো হয়েছে সকল মানবজাতির জন্য। [(১) বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২০৭, বর্ণনা সংখ্যা ৫৫০১]

অধ্যাত্মিক সম্রাট আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রাহঃ) (১৯১৩-২০০৮ইং)

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির পথ প্রদর্শক হিসেবে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী-রাসূলদের দাওয়াত এ জমিনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন আওলিয়ায়ে কেরামগণ। যারা পথভুলা মানুষকে দিয়েছেন সঠিক পথের দিশা। বিশ্বনন্দিত ওলী, আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট, মুজাদ্দিদে জামান, হাদীয়ে বাংলা, রাহবারে দ্বীন, আয়নায়ে জামালে আহমদী, শামছুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সে সকল আওলীয়া কেরামদের উত্তরসূরি বর্তমান সময়ের অন্যতম বুযুর্গ। আল্লাহর দ্বীন এ জমিনে প্রতিষ্ঠা করতে জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাহেলিল্লাহ ছিলেন। এ মহা মনীষীর সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে পেশ করছি।

নাম ঃ মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ চৌধুরী (ফুলতলী ছাহেব নামে সর্বমহলে পরিচিত), পিতা ঃ হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল মজীদ (রাহঃ)। তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য ও বিখ্যাত আলেমে দ্বীন ও ফকীহ। আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ ১৯১৩ ঈসায়ী মোতাবেক ১৩২১ বাংলা সনের ফাল্গুন মাসের বৃহস্পতিবার সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানাধীন ফুলতলী গ্রামে প্রখ্যাত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামনী (রাহঃ)-এর সাথী ৩৬০ আউলিয়ার একজন শাহ কামাল (রাহঃ)-এর বংশধর। বাল্য বয়সে সকল মহা মনীষীদের মধ্যে যে সমস্ত গুণ পাওয়া যায় আল্লামা ফুলতলী ছাহেবের বেলায়ও তা-ই ছিল। খেলাধুলা, গল্প-গুজব, হাসি-তামাশা ও ঘোরাফেরা ছিল তাঁর স্বভাববিরোধী।

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর প্রাথমিক শিক্ষা বাদে দেওরাইল ফুলতলী আলীয়া মাদ্রাসা থেকে শুরু হয়। চাচাত ভাই হযরত মাওলানা মোহম্মদ ফাতির আলী ছাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন হয়। তখন ফুলতলী ছাহেবের ওয়ালীদ মুহতারাম জকিগঞ্জের গঙ্গাজল মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এরপর ভারতের আসাম প্রদেশের হাইলাকান্দি জেলার হাইলাকান্দি রাঙ্গাউটি মাদ্রাসার সুপার মাওলানা মোঃ আব্দুর রশিদ সাহেবের অনুরোধে ১৩৩৬ বাংলা সনে সেখানে তাঁর পিতা ভর্তি করিয়ে দেন। ফুলতলী ছাহেব কৃতিত্বের সাথে প্রথামিক শিক্ষা শেষ করে আল্লামা শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (রাহঃ)-এর পরামর্শক্রমে ১৯৩১ সালে-বদরপুর

সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন। আর সেখানেই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বরাবরের মত সুনামের সাথে শেষ করেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করে তদীয় ওস্তাদ ও মুর্শিদ বদরপুরী (রাহঃ)-এর নির্দেশে উচ্চ শিক্ষা অর্জনার্থে ভারতের বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায়ে আলিয়া রামপুরে ভর্তি হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা শেষ করে ইলমে হাদীসের শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে মাতলাউল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি ওই মাদ্রাসায় অধ্যয়নের পর হাদীসের চুড়ান্ত পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে ১৩৫৫ হিজরী সনে ইলমে হাদীসের সনদ লাভ করেন। তাঁর হাদীস শরীফের ওস্তাদ ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত খলিলুল্লাহ রামপুরী (রাহঃ) ও হযরত মাওলানা ওয়াজিহ উদ্দীন রামপুরী (রাহঃ)। এছাড়াও তিনি ইলমে তাফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্রেও গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ইলমে কিরাতে সর্বোচ্চ ডিগ্রীও অর্জন করেন। ছাহেব কিবলাহর পীর ও মুর্শিদ শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (রাহঃ) ইলমে কিরাতের অন্যতম ওস্তাদ। মুর্শিদের পরামর্শক্রমে ইলমে কিরাতের ওপর আরো মাহির হওয়ার জন্য প্রথমে বিশ্ববিখ্যাত ক্বারী হযরত ইরক্বস মিশলী (রাহঃ)-এর অন্যতম শাগরিদ হযরত মাওলানা হাফিজ আব্দুর রউফ করমপুরী (রাহঃ) ও পরবর্তীতে বিশ্ব ক্বারী, মক্কা শরীফের ইমামগণের পরীক্ষক হযরত আহমদ হেজাজী (রাহঃ)-এর কাছে ১৩৫১ সনে প্রথমবার এবং এর পর দ্বিতীয় বার গিয়ে সমস্ত কোরআন শুনিয়ে ইলমে ক্বিরাতের সর্বোচ্চ সনদ অর্জন করেন। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র তিনিই হযরত আহমদ হেজাজী (রাহঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। হযরত ফুলতলী সাহেব কিবলাহর কিরাতের সনদ তিন সিলসিলায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে।

শায়খুল হাদীস শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর কর্মজীবনের সুচনা হয় শিক্ষকতার মহান পেশা দিয়ে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সালে পর্যন্ত বদরপুর আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন। সেখানে দক্ষতার সাথে তিরমিযি শরীফ, নাসাঈ শরীফ, বায়দ্বাবী শরীফ ও ইতক্বানসহ হাদীস ও তাফসীরের বিভিন্ন কিতাবাদীর অধ্যাপনা করেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ফুলতলী আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি সিলেটের ঐতিহ্যবাহী গাছবাড়ী আলিয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিছ হিসেবে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রিন্সিপালের দায়িত্ব সুদীর্ঘ ছয় বৎসর পর্যন্ত পালন করেন। বিশ্বনাথ থানায় ঐতিহ্যবাহী সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদ্রাসা ও জকিগঞ্জের ইছামতি কামিল মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে বোখারী শরীফের তালিম দিতেন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর নিজ বাড়ীর মাদ্রাসা বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদ্রাসায় সপ্তাহে দু'দিন শনি ও রোববার বোখারী শরীফের দরস দিতেন।

শায়েখুল কুররা আল্লামা ফুলতলী পীর ছাহেব কিবলাহ (রাহঃ) মক্কা শরীফ থেকে দেশে ফিরে এসে প্রদিতিন কিছু সময় বিশুদ্ধ কোরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দান করতেন ভারতের বদরপুর ৩৬০ আওলিয়ার সাথী হযরত আদম খাকী (রাহঃ)-এর মাজারের পার্শ্বে। মদীনা ওয়ালার ইশারা পেয়ে শুরু করেন বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষার নিয়মিত খেদমত। ১৯৪০ সালে আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ নিজ বাড়ীতে ইলমে কিরাতের প্রশিক্ষণ শুরু করেন এবং 'দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট' নামে একটি বোর্ড গঠন করেন। শুরু থেকে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি তার ভূ-সম্পত্তির এক বিশাল অংশ (প্রায় ৩৩ একর) জমি 'দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টে'র নামে ওয়াকফ করে দেন।

পীরে তরিকত, রাহনুমায়ে শরিয়াত আল্লামা ফুলতলী ছাহেবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ১৮ বৎসর বয়সে কাদিরিয়া চিশতিয়া, নকশ বন্দিয়া, মুজাদ্দদীয়া ও মোহাম্মদীয়া তরীকার ছবক গ্রহণ করে মা'রিফাতের উচ্চ মাকামে উত্তীর্ণ হন।

খাদিমুল উম্মাহ মোজাহিদে মিল্লাত, আল্লামা ফুলতলী ছাহেব দ্বীন ইসলামের খেদমত সমাজসেবায় স্থাপন করেছেন এক অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একজন অতি সুদক্ষ সংগঠক হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে অবস্থানকারী একজন ইসলাম দরদী সাংগঠনিক চৌকস বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। জাতীয়ভাবে ইসলামী ইস্যুতে বিশেষতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্যোগ মুহূর্তে উদারচিত্তে ঐক্যের অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়।

দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী ওলীয়ে কামিল আল্লামা ফুলতলী ছাহেব দেশ-বিদেশে অসংখ্য মাদ্রাসা-মসজিদ ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পরামর্শক্রমে গড়ে উঠেছে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সেবামূলক সংগঠন। সংগঠনগুলো হচ্ছে– গণমানুষের সংগঠন– আনজুমানে আল ইসলাহ বাংলাদেশ, আনজুমানে

তালামীযে ইসলামিয়া, লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি, দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট, আনজুমানে মাদারিছে আরাবিয়া (অঞ্চলিক মাদ্রাসা সংগঠন), জালারিয়া আল-কোরআন গবেষণা পরিষদ বালাগঞ্জ, শাহ জালাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি। এছাড়া বাংলাদেশের শিক্ষকদের বৃহৎ সংগঠন জামিয়াতুল মোদার্রেছীন বাংলাদেশের সম্মানিত উপদেষ্টাও তিনি। সমাজকল্যাণ সংস্থার 'মুসলিম হ্যান্ডস বাংলাদেশ'-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ফুলতলী ছাহেব বাড়ীতে ফ্রি ডিসপেন্সারী (চিকিৎসা কেন্দ্র) স্থাপন করেছেন। এতিমদের জন্য এতিমখানা খোলা হয়েছে এবং অসহায় মানুষদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন লঙ্গরখানা। গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণের প্রকল্প চালু করেন। অসহায় মানুষের মাঝে সেলাই মেশিন, টিউবওয়েল ও নারিকেল গাছ বিতরণ করতেন। অদ্যাবধি তা চালু রয়েছে। এছাড়া অনেক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক।

সুন্নিয়তের অতন্দ্র প্রহরী আল্লামা ফুলতলী ছাহেব ইসলামের সামগ্রিক বিষয়ে বিশেষ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদানির্ভর বিষয়াবলীর ওপর উচ্চতর জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য ফুলতলী ছাহেব স্থাপন করেছেন একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় 'দারুল মুতায়ালা'। উক্ত গ্রান্থাগারে রয়েছে আরবী, ফারসি, উর্দুসহ বাংলাভাষার দুর্লভ কিতাবাদির বিপুল সমাহার। এসব কিতাব তিনি দেশ–বিদেশে সফরকালে সংগ্রহ করেন।

ফুলতলী ছাহেব কর্মময় জীবনের শত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও মুসিলম জাতির স্বার্থে কলমি শক্তি চালিয়ে যান। তাফসীর, আকাঈদ, তাজবীদ ও আমল বিষয়ের ওপর রচনা করেছেন নির্ভযোগ্য কিতাব। তাঁর কিতাবগুলো বাংলাদেশসহ ভারতের বিভিন্ন মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁর রচিত কয়েকটি কিতাবের নাম– আত তানবীর আলাত তাফসীর, মুন্তাখাবুস সিয়র, আল খুতবাতুল ইয়াকুবিয়া, আনোয়ারুস সালিকীন, নালায়ে কলন্দর, শাজরায়ে তায়্যিবাহ, নেক আমল, আল কাউলুছ ছাদিদ ইত্যাদি।

ইতিহাস তালাশ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সমকালীন সরকারের রোষানলে পড়ে কারাবরণ করেন। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি ১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বর থেকে দীর্ঘ ২৪ মাস ৬দিন সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন। কারাগারেও তিনি থেমে থাকেননি। চালিয়ে গেছেন দ্বীনের তালিম, রচনা করেন মূল্যবান ইসলামী গ্রন্থ। জেল সুপার অলি আহমদের বিশেষ সহযোগিতায় সেখানে বিশুদ্ধ কিরাত শিক্ষা দেয়া শুরু করেন। অনেক মুসলমান কারগারে ফুলতলী ছাহেরব কাছে কোরআনের ক্বারী হন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব

মাওলানা জাকির হোসাইন আজাদী

"হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন– যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কেতাব ও হেকমাত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।" (সূরা আল বাকারা ১২৯ আয়াত)

সুধী পাঠকবৃন্দ! আমাদের মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কাবা গৃহ নির্মাণ কাজ শেষ করে আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছিলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্য। আল্লাহতায়ালা সে দো'য়া মঞ্জুর করে নিয়েছিলেন। যার ফলে তাঁর বংশধরদের মধ্য হতেই আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আগমন। মাদানী জীবনের এক সময় তাঁর সাহাবীদের সাথে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, আমি আমার সূচনা বলে দিচ্ছি, "আমি আমাদের পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর দোয়া, ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যত বাণী এবং স্বীয় জননীর সত্য স্বপ্নের ব্যাখ্যা। হযরত ঈসা (আঃ) ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন, "আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন। তাঁর নাম আহমাদ।" আর মুহাম্মদ (সাঃ) যখন মা আমিনার গর্ভে, সে সময় তাঁর মা স্বপ্নে দেখেন, তাঁর পেট হতে একটি নূর বের

হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে।

আমরা জানি, মুহাম্মাদ (সাঃ) ৫৭০ খ্রীস্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল মতান্তরে ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবারে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর জন্মের মাত্র ৫০ দিন আগে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। ইয়েমেনের বাদশা আবরাহা পছন্দ করলো না পৃথিবীর প্রথম ইবাদতখানা কাবা শরীফকে। সে চিন্তা করলো এত মানুষ মক্কার কাবাঘরে হজ করার জন্য যায়! মানুষদের এই স্রোতকে ভিন্নমুখী করার জন্য ‘ছানআ’ নামক স্থানে সে একটি গির্জা তৈরী করল এবং তার লোকদের দিয়ে ছানআর গির্জায় মানুষদের হজ করার জন্য ঘোষণা করে দিল। তাতে লোকেরা তার গির্জায় তো হজ করার জন্য গেলই না বরং একজন ব্যক্তি রাতে তার ঐ গির্জায় পায়খানা করে আসল। তাতে আবরাহা অগ্নিশর্মা হয়ে মক্কার কাবাঘরকে ধ্বংস করার জন্য বিশাল হস্তি বাহিনী মওজুদ করলো। এখবর মক্কায় ছড়িয়ে পড়ায় কাবার রক্ষণাবেক্ষণকারী আব্দুল মুত্তালিব কাবার গেলাফ ধরে আল্লাহতায়ালার কাছে প্রার্থনা করলেন, “হে আল্লাহ! আবরাহার হস্তিবাহিনীর মোকাবিলা করার মত শক্তি সামর্থ্য আমাদের নেই; তুমিই তোমার ঘরকে রক্ষা করো”। এই কথা বলে পাহাড়ের আড়ালে নিরাপদ স্থানে চলে গেলেন। আবরাহা যে সময় তার হস্তিবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছিল, তখন আল্লাহতায়ালা নগণ্য পাখি দ্বারা তাদেরকে শায়েস্তা করেন। পথিমধ্যে হঠাৎ আবরাহার হস্তিবাহিনী থেমে যায়। সামনে চালানোর চেষ্টা করলেও আনা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে তারা উপরে তাকিয়ে দেখেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিকুল তাদের মাথার উপর। মুহূর্তেই পাখিরা তাদের কার্যক্রম শুরু করে দিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা কুরআন শরীফে একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন। যার নাম ‘সূরাতুল ফীল’। সেখানে আল্লাহতায়ালা বলেছেন– “(১) আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রতিপালক হস্তিবাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাত করে দেননি? (৩) তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি (৪) যারা তাদের উপর সিজজিনের কংকর নিক্ষেপ করছিল (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে খাওয়া তৃণ সদৃশ্য করে দেন।” তাফছীরে বলা হয়েছে প্রত্যেক পাখি তিনটি করে পাথর নিয়ে এসেছিল, দু’পায়ে দু’টি আর ঠোঁটে একটি।

এই ঘটনার ৫০ দিন পরেই মুহাম্মদ (সাঃ) পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হলেন। জন্মের সময় মক্কার প্রথা অনুযায়ী বাইরের ধাত্রীদেরকে বিশেষ করে বনি সা’দ গোত্রের ধাত্রীদেরকে আহ্বান করা হলো। তার কারণও ছিল। অন্যান্য গোত্রের তুলনায় বনি সা’দ গোত্রের মানুষদের মুখের ভাষা ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ উচ্চারণে তারা কথা বলতেন। যার কারণে মুহাম্মদ (সাঃ) অশুদ্ধ উচ্চারণে জীবনে কখনো কথা বলেননি। বনি সা’দ গোত্র হতে যেসব ধাত্রী এসেছিলেন তাদের একজন ছিলেন হালিমা। ঘটনাটি ছিল এমন– হালিমার উট বা গাধাটি দুর্বল থাকায় সবার পিছে ছিলেন। আগে আসা ধাত্রীরা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কোলে নিল। তারপর যখন জানতে পারলো এই শিশু ইয়াতিম, তাকে লালনপালন করলে পারিশ্রমিক কম পাবে। তারা কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। সবার শেষে এলেন হালিমা। শিশু নবীর ফুটফুটে সুন্দর চেহারা দেখে কোলে উঠিয়ে নিলেন। যখন জানতে পারলেন এই শিশু ইয়াতিম তাকে লালন-পালন করলে পারিশ্রমিক কম পাবে, তারপরও তাকে একবার যে কোলে উঠিয়ে নিয়েছিলেন, কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে যাননি। যখন শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিয়েছিলেন তখন পূর্বের এইসব ধাত্রীদেরকে পিছে ফেলে রেখে যাচ্ছিলেন। তারা বললো– হালিমা এটাতো তোমার সেই আগের উট বলে মনে হচ্ছে না। যে উট নিয়ে তুমি আমাদের পিছে পিছে ধীরগতিতে এসেছিলে? হালিমাতুস সাদিয়া বললেন, এটাতো সেই আগেরই উট কিন্তু যে শিশুটিকে আমি এর উপর আরোহণ করিয়েছি এই শিশুর বরকতে আমার দুর্বল উট শক্তি ফিরে পেয়েছে। তাছাড়া হালিমার পরিবারে অভাব ছিল। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বরকতে পরিবারের সব অভাব-অনটন চলে গেল। ছয়টি বছর শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-কে লালনপালন শেষে মা আমিনার কাছে তাকে পৌঁছে দিলেন। বাড়ী ফিরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পিতার খোঁজ নিলেন। মা আমিনা বললেন, তোমার জন্মের ছয়মাস আগেই তোমার পিতা আব্দুল্লাহর ইন্তেকাল হয়েছে। মুহাম্মদ (সাঃ) সেই বয়সেই তাঁর পিতার কবর জিয়ারত করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করলেন। মা আমিনা একজন ক্রীতদাসী উম্মে আয়মানসহ মুহাম্মদ (সাঃ)কে নিয়ে মদীনায় স্বামী আব্দুল্লাহর কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসলেন। ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ‘আবওয়া’ নামক স্থানে মা আমিনার ইন্তেকাল হলো। মুহাম্মদ (সাঃ) এই বয়সেই পিতৃ-মাতৃহীন ইয়াতিম হয়ে গেলেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হতে থাকলেন। এরপর ৮ বছর বয়সে দাদা আব্দুল মুত্তালিবেরও ইন্তেকাল হলো। চাচা আবু তালেবের তত্ত্বাবধানে তিনি পালিত হতে শুরু করলেন। ১২/১৩ বছর বয়সে একদিন বায়না ধরলেন চাচার সাথে সিরিয়ায় সফরে যাওয়ার। চাচা আবু তালিব নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন মুহাম্মদ

(সঃ)-কে, তাঁর দাবী না রাখলে তিনি কষ্ট পাবেন। এটা আবু তালেব সইতে পারবেন না। তাই মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সফরে নিয়ে গেলেন। সিরিয়ায় গিয়ে একটি গাছের ছায়ায় তাঁকে বসার ব্যবস্থা করে নিজে মালসামানগুলো বিক্রয় করার জন্য গেলেন। সে সময় একজন খ্রীস্টান পাদ্রী যার নাম রাহেব বুহাইরা। তিনি চাঁদের মত ফুটফুটে সুন্দর একটি শিশুকে গাছের ছায়ায় দেখে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর দেখেন সূর্য ঢলে পড়ায় শিশুটির গায়ে যাতে রৌদ্র লাগতে না পারে তার জন্য গাছের ডালটি সরে এসে শিশুটিকে ছায়া প্রদান করছে। তখন রাহেব বুহাইরা ভাবছেন এই শিশু নিশ্চয় সাধারণ কোন শিশু নয়, এই শিশু নিশ্চয় বিস্ময়কর কোন শিশু। কাছে এলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? বলেন, মুহাম্মদ। আর কোন নাম আছে? বলেন, আহম্মদ। পিতার নাম কি? আব্দুল্লাহ, মাতার নাম? আমিনা, দাদার নাম? আব্দুল মুত্তালিব, চাচার নাম? আবু তালিব। তুমি কার সাথে এসেছো? চাচা আবু তালেবের সাথে। তিনি কোথায়? ঐতো লাইনে দাঁড়ানো মাল বিক্রয় করার জন্য। বুহাইরা সেখানে গিয়ে বললেন, আবু তালেব, তোমার ভাইয়ের ছেলে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে যতদূর আমি তৌরাত কিতাবে জেনেছি, তিনিই হবেন আখেরী নবী। আপনি তাকে নিয়ে দ্রুত মক্কায় ফিরে যান, তা না হলে ইহুদীরা জানতে পারলে তারা শিশু নবীর উপর আক্রমণ করতে পারে। (চলবে)

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে প্রিয় নবী (সাঃ) ও আজকের বিশ্ব

মুহাম্মদ বায়েজীদ হোসাইন সালেহ

স্বজনপ্রীতি মানুষের চিরন্তর স্বভাব। যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। সামাজিক জীবনে পারস্পারিক হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কলহ, মারামারি, অন্যায়-অত্যাচার, অশান্তি-বিচ্ছৃংখলা ইত্যাদি এ স্বজনপ্রীতির বিষফল। আদিকালে যখন মানবতা ধুঁকে ধুঁকে মরছিল, অনহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন-যাপনকারীদের করুণ আর্তনাদে যখন আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছিল, আব্রুহারা নারীদের তরঙ্গমালার ন্যায় করুণ আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছিল, অপসংস্কৃতির উত্তাল জোয়ার সমাজকে প্লাবিত করছিল 'ঈফমমঢ তমর ঠফমমঢ'ই ছিল যাদের যুদ্ধের মূলনীতি। 'ূধথর্দ ধ্র রধথর্দ' এ প্রথা ছিল এক গোত্রের উপর অপর গোত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের চালিকাশক্তি। ঠিক এমনি এক বিভীষিকাময় মুহূর্তে জুলুম-নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে সাম্য, মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, সংহতি, ন্যায় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৌধমালার উপর ইসলামী আদর্শ সংগঠক হয়ে ধরাধামে আবির্ভূত হন, গণতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক, ইসলামী সমাজ বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক, সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বশেষ্ঠ বীর সিপাহসালার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)। তাইতো কবি বলেন ঃ মরুর বুকে এলেন রাসূল/ আলোর মশাল নিয়ে/ দূর করিলেন সকল আঁধার/ মুখের বাণী দিয়ে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী তার ঔর্ধ্রমরহ মত ইরটঠ্র গ্রন্থে বলেন, 'ূণশণর ধভ´দণ দর্ধ্রমরহ মত´দণ ষমরফঢ ষট্র´দণ ভণণঢ্রম থরণর্ট টভঢ ´দণ´ধবণ্রমরধযণ তমর´দণ টযযণটরটভডণ মত ট ঢণফধশণরণর' সঙ্গত কারণেই প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সমগ্র জীবন পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, তাঁর জীবনে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্রও নেই। প্রিয় নবী (সাঃ)-এর পবিত্র জিন্দেগী আলোচনা পর্যালোচনা করলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া যায় যে, তিনি উদার ও একনিষ্ঠতার দ্বারা অশান্ত ও বিচ্ছৃংখলায় পরিপূর্ণ সমাজ হতে চিরশান্তির নীড়ে মানব জাতিকে আরোহণ করিয়েছেন। 'ঔণরম্র টভঢ দণরম ষমব্রদধয' গ্রন্থে সুটল্যান্ডের সুধী গ্রন্থাকার স্যার টমাস কার্লাইল বলেন– 'র্ফ ষট্র ঠধর্রদ তরমব ঢটরপভণ্র´ম ফধথর্দ' অর্থাৎ অন্ধকার হতে আলোর পথের দিশারী ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

নিম্নোক্ত আলোচনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর অবদান কি ছিল তা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

সাম্প্রদায়িকতার কি ঃ প্রথমেই আমাদের জানা প্রয়োজন সাম্প্রদায়িকতা কাকে বলে? বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সম্প্রদায়ের সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মারডেক বলেন, প্রত্যক্ষ মেলামেশার মাধ্যমে একত্রে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের সর্ববৃহৎ গোষ্ঠীই সম্প্রদায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্জেস-এর মতে- একটি ক্ষুদ্র আঞ্চলিক গোষ্ঠীর নাম সম্প্রদায় যাদের ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন হয়।

প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জি, ডি এইচ কোলের মতে, সম্প্রদায় হলো একটি সতত পরিবর্তনশীল জনসমষ্টি। যারা অভিন্ন রীতি ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে বসবাস করে এবং একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কিংসলী ডেভিড বলেন, যা ক্ষুদ্র ভৌগোলিক জনগোষ্ঠী তাই সম্প্রদায়। উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটের মাঝে গভীরভাবে চিন্তা করলে অনুধাবন করা যায় যে কোন নিদিষ্ট জনমণ্ডলীর মাঝে স্বজাতি মোহ যখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে, যার প্রবলতা ও হিংস্রতা নির্দিষ্ট গণ্ডিবহির্ভূতদের জন্য ঘৃণাই মনে করে এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্বগোত্রীর কেউ অন্যায় আচরণ করলেও তা অন্যায় মনে করে না। তখনই তাকে উগ্র সাম্পদায়িকতা বলে।

ইতিহাস সাক্ষী প্রাক-ইসলামী যুগে সাম্প্রদায়িকতা জিনিসটি আরবদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হারে বিদ্যমান ছিল। প্রিয় নবী (সাঃ) অত্যন্ত শক্তভাবে এ সাম্প্রদায়িতকার মুলোৎপাটন করেন। সমূলে বিনাশ করেন। তাঁর পূত-পবিত্র জীবন ও মুখ নিঃসৃত অমীয় বাণীগুলো পর্যালোচনা করলে এ সত্য সূর্যালোকের ন্যায় উজ্জ্বলতা ধারণ করে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে প্রিয় নবী (সাঃ) ঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে প্রিয় নবী (সাঃ) -এর অবদান অনস্বীকার্য কদণ ফধতণ মত ুমদটববটঢ(ব.) গ্রন্থে ঐতিহাসিক বার্মিংহাম বলেন, মূলত আরবরা ছিল উচ্ছৃংখল ও বিভেদপ্রিয়। নবী (সাঃ) তাদের একই প্লাটফর্মে একীভূত করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঋভডহডফমযণটঢধট মত ঈরর্ধটভধডট-এর মধ্যে উল্লেখ আছে ৃতত টফফ´দণ রণফধথধমল্র যণব্রমভটফর্ধধ্র মত´দণ ষমরফঢ ুমদটববটঢ(ব.) ষট্র´দণ বর্ল্র্লডডগ্রতলফ; অর্থাৎ পৃথিবীর ধর্ম নেতাদের মধ্যে সর্বাধিক সাফল্য লাভ করেছেন মুহাম্মদ (সাঃ)।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক এরশাদ করেন– ‘হে মানবমণ্ডলী নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেজগার। (হুজুর ঃ আয়াত ১৩)। অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ তোমরা ন্যায়পরায়ণতার সাথে আল্লাহরওয়াস্তে সাক্ষী হয়ে যাও এবং কোন গোত্রের বাড়াবাড়ি যেন তোমাদিগকে ইনসাফ থেকে বিমুখ না করে । জেনে রাখবে ন্যায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকাও তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। (মায়েদা, আয়াত-৮)।

সম্প্রীতির লক্ষ্যে পবিত্র কালামে এসেছে, সত্য নির্ভুল পন্থা ছাড়া অন্যায়ভাবে তোমরা কোন মানুষকে হত্যা করবে না, যা আল্লাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। (বনী ইসরাইল, আয়াত-৩৩)।

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে– যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচারকের দায়িত্ব পালন করবে, তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করবে। (সূরা নিসা, আয়াত-৫৮)।

সাম্প্রদায়িকতার বিষজাল ছিন্ন করার উদ্দেশে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন– এক ব্যক্তি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি। ঐ ব্যক্তি থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছি। এ দুজন থেকে অনেক পুরুষ ও অনেক মহিলা দুনিয়াতে ছড়িয়ে আছে। (সূরা নিসা, আয়াত-১)।

উপরে বর্ণিত পবিত্র আয়াতে কারীমার পরিপূর্ণতা বাস্তবতার নিরিখে প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রিয় নবী (সাঃ)। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে প্রিয় নবী (সাঃ) অমূল্য বাণী ও যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছেন। ঐতিহাসিক বিদায় হজের ভাষণে প্রিয় নবী (সাঃ) দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে ঘোষণা করেন, নিশ্চয়ই তোমাদের একজনের জন্য অন্যজনের জানমাল, ইজ্জত হরণ করা সম্পূর্ণ হারাম। যেমনি আজকের দিনে তোমাদের জন্য হারাম। তিনি আরো ঘোষণা করেন, জেনে রেখ অঞ্চল ও বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান সমপর্য্যায়ভুক্ত। আজ হতে বংশগত কৌলিন্য প্রথা বিলুপ্ত হল। তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাধিক কুলীন, যে স্বীয় কাজের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে আগ্রহী।

সম্প্রীতি স্থাপনের বাধার দিক উল্লেখ করে তাঁর মুখ নিঃসৃত আমীয় বাণী ধ্বনিত হয়েছে– নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস এ জন্য এসেছিল যে, তাদের অভিজাত শ্রেণী চুরি করলে ছেড়ে দেয়া হতো এবং দুর্বল শ্রেণী চুরি করলে শাস্তি দেয়া হতো। আল্লাহর কসম, যদি ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করে তবুও তার হাত কাটা হবে।

হযরত ওমরকে লক্ষ্য করে প্রিয় নবী (সাঃ) বলেন, হে ওমর! আজ তুমি মানুষকে কি দাসে পরিণত করবে? অথচ মানুষের মাতৃকুল মানুষকে স্বাধীন করে জন্ম দিয়েছে। অধিকন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্থপতি হিসেবে প্রিয় নবী (সাঃ) এ বিষয়ের নির্দেশসম্বলিত অসংখ্য হাদীস রেখে গেছেন।

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর প্রিয় নবী (সাঃ) উপলব্ধি করলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন না হলে আরবে ঐক্য ও ঐশ্বর্য্য ফিরে আসবে না। ঐক্য, শান্তি, সম্প্রীতি ও স্থিতির জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় শক্তি। তাই প্রিয় নবী (সাঃ) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। যে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হন প্রিয় নবী (সাঃ)। যে রাষ্ট্রের সংবিধানের ধারা লিখিত ও ঘোষিতসহ মোট ৫৩টি। ঐতিহাসিক ইবনে হিশামের বর্ণনা মতে, সংবিধানের প্রথম ধারাতে এরূপ লেখা ছিল, সনদে স্বাক্ষরকারী সকল জাতি যেমন মুসলিম, ইহুদী, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিক মিলে একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে। সকল নাগরিক সমঅধিকার ভোগ করবে। মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সমগ্র আরবে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর জন্য মদীনা রাষ্ট্রের বিশেষ কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। মুসলমান ও অমুসলমান সকলেই সমান অধিকার ভোগ করতো। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য প্রিয় নবী (সাঃ) সহনশীল নীতি গ্রহণ করেন এবং মদীনা রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। এ ন্যায়বিচার মুসলমান, ইহুদী-নাসারা ও পৌত্তলিকরা মেনে নিয়েই মদীনা রাষ্ট্রে সুখে দিন কাটিয়েছে।

আপনাদের জিজ্ঞাসার জবাব

১। মোহাম্মদ ওলীউর রহমান শিহাব, কাঞ্চনপুর, নোয়াখালী।

জিজ্ঞাসা ঃ ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন দখলদার বাহিনীর আগ্রাসনের পর আরব অঞ্চলের ইসলামী জীবনবোধে কোন রকম পরিবর্তন সূচিত হবে বলে কি আশঙ্কা করা যায়?

জবাব ঃ ইয়েমেন রাষ্ট্রটি মুসলিম হয়েও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসারী। ওমান, জর্ডান, আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, বাহরাইনসহ সৌদি আরবে ইহুদী ও খৃস্টানদের মাতব্বরী বেড়েই চলেছে। আরব অঞ্চলে একথাও ছড়িয়ে পড়েছে যে, আরবদের রাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের চেহারা-সুরত বদল হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত লাগা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ক্ষুদ্র-বৃহৎ আরব দেশগুলোতে বর্তমানে যা লক্ষ্য করা যায় তাহল, ইঙ্গ-মার্কিন সহায়তায় ভোগবাদী রাজতান্ত্রিক পদক্ষেপকে টিকিয়ে রাখা। তারা মূলত ইহুদী ও খৃস্টানদের বগলে আশ্রয় নিয়ে ফেলেছে বললে বেশী বলা হবে না।

২। মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন ভূঞা, বেগমবাজার, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা ঃ বর্তমানে 'বাইতুল মুকাদ্দাস' ভ্রমণ করতে চাইলে ইহুদীদের নিকট থেকে ভিসা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ভবিষ্যতে 'হজ' আদায় করতেও কি ইহুদী ও খৃস্টানদের নিকট থেকে ভিসা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে?

জবাব ঃ এমন অবস্থার অবতারণা ঘটুক তা কোন মুসলমানের কাম্য হতে পারে না। তবে নানা দুর্বলতার সুযোগে যে হারে ইহুদী ও খৃস্টান সচতুর মহিলারা আরবদের খোশমহলে কর্তৃত্বের আসন পেতে বসেছে তাতে কোথাকার পানি কোথায় গড়ায় তা নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার।

৩। মোহাম্মদ হাসিবুল হক হাওলাদার, হাতিরপুর ঢাকা।

জিজ্ঞাসা ঃ পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়াই যেসব